Vol. 32 | No. 3 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের চৈতালি

Volume	32
Issue	3
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i3.1
Pages	1-6
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথের চৈতালি

Check for updates

সৈয়দ আলী আহসান

রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে একটু ব্যতিক্রম। এর মধ্যে বিভিন্ন অভাবিত দৃশ্য আছে, আকস্মিকের আবির্ভাব আছে, অবান্তরও অনেক কিছু আছে। নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটি ডাল যদি আটকে পড়ে তাহলে সেখানে শৈবাল ঘন হয়ে এসে ঠেকে, নানাবিধ আবর্জনা এসে জুড়ে বসে—একটি অপ্রত্যাশিত সীমানা তৈরী হয়। গ্রন্থাবলীতে একথাগুলো রবীন্দ্রনাথেরই বলা। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর কাব্য প্রবাহের ধারাক্রমের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম এবং বিচ্ছিন্ন। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে টুকরো টুকরো চিত্র, অল্প পরিসরের ঘটনা, অল্প পরিধির ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মূলতঃ পল্লী গ্রামের বিচিত্র জীবন, লোকালয়, গোয়াল ঘর, ধানের মারাই, বিচালীর স্তূপ, বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্য ক্ষেত—এই সমস্ত চিত্র। 'নৈবেদ্য' এ রূপ পেয়েছে এবং এই রূপ বর্ণনাটি অত্যন্ত নিরাভরণ ভঙ্গিতে কবি করেছেন। কবি যেটা দেখেছেন সেটাই যথেষ্ট ভেবে কোনরূপ অলংকার ছাড়াই তাকে প্রকাশ করেছেন। সেই কারণেই 'চৈতালি'র ভাষা অত্যন্ত সরল এবং সহজ। স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে কবি নিরলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

'চৈতালি' বাংলা ১৩০৩ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা চৈত্র মাসে লিখিত হয়েছিল বলে বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছিলেন।

গ্রন্থের আরম্ভের কবিতাটি 'উৎসর্গ' নামে চিহ্নিত। এই কবিতাটি সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকা রূপে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কবিতাটিতে ফলভারে পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাকুঞ্জের একটি অপূর্ব উপমা আছে এবং কেউ

দ্রাক্ষাকুঞ্জ প্রত্যক্ষ না করলে এহেন বর্ণনা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। বঙ্গভূমিতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখেছিলেন বিদেশে। অল্প বয়সে বিলেতে যখন গিয়েছিলেন তখনকার লেখা 'বিলেত-যাত্রীর পত্র' এর মধ্যে পথের পার্শ্বে যে দ্রাক্ষাকুঞ্জ দেখেছিলেন তার বিবরণ আছে, এটা তাঁর মনে নিশ্চয়ই খুব গভীর দাগ কেটেছিল। দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং পরিপূর্ণ নিটোল দ্রাক্ষাফলের এত অপূর্ব সার্থক বর্ণনা বাংলা কাব্যে আর নেই। কবি তার মনকে দ্রাক্ষাকুঞ্জ বলে অভিহিত করেছেন। দ্রাক্ষাকুঞ্জে যেমন গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরে এবং ফলভারে শাখা আনত হয়, তেমনি গ্রামের প্রকৃতিতে তিনি যে সমস্ত দৃশ্য দেখেছেন সেগুলো তার মনকে পরিপূর্ণ করেছে উচ্ছ্বাসে। কবি তার পাঠককে তাঁর কাব্যের এই উপঢৌকনগুলো সুখাবেগে গ্রহণ করতে বলেছেন। 'উৎসর্গ' কবিতাটি খুব বিস্তৃত নয়, পল্লবিত নয়, নিটোল দ্রাক্ষার মতই সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে অনুনাসিক ধ্বনির বিস্তার অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছে যার ফলে একটি সমর্পণের বিনয়াবনত ভঙ্গি সুস্পষ্ট হয় :

তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ—
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন নিবেদন।

'চৈতালি'র দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'গতিহীন'। কবি কল্পনা করেছেন তাঁর প্রেরণাদায়িনী কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই তিনি আর পূর্বের মত একটি বিশেষ ধারাক্রমে কবিতা রচনায় সক্ষম হচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় যে আবেগ ছিল এবং বিশেষ বিশেষ উপলব্ধির প্রগাঢ়তা ছিল এখন আর তা নেই, এখন শুধু লঘু চাপল্য এবং আনন্দ। তিনি বসন্তের উচ্ছ্বাস দেখছেন চতুর্দিকে, বাগানে ফুল ফুটে রয়েছে দেখছেন, কোকিলের ডাক শুনছেন, কিন্তু এগুলোর মধ্য

দিয়ে অথবা এগুলোকে অবলম্বন করে জীবনের কোন নিগূঢ় উপলব্ধি রূপ লাভ করছে না। সমস্ত কিছু লঘু তাৎক্ষণিকতায় পর্যবসিত। অর্থাৎ কবি সহজ সহজ আনন্দে ছোট ছোট ছবির ছায়া স্পষ্ট করে দেখছেন। সহজ সুরে সহজ কথা বলার অভিলাষ 'চৈতালি'র প্রতিটি কবিতায় অভিব্যক্ত। তিনি বলছেন যে, তিনি যে ক্ষমতায় কবিতা লিখতেন সে ক্ষমতা দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি পেয়েছিলেন। তাই এতদিন তিনি আপন প্রাণ থেকে অক্ষয় গীতস্বর প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র দেখেই তিনি তৃপ্ত। গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে জীবনকে স্পর্শ করবার দুঃসাহস এখন তার নেই। মোট কথা লঘু আনন্দ প্রকাশের কৈফিয়ত স্বরূপই এই কবিতাটি লেখা।

'স্বপ্ন' কবিতাটি একটি কোমল মধুর অনুভূতি। কবি স্বপ্নে তার মাতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি তাঁর শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে ছিচ্ছেন এবং আশ্বাস দিচ্ছেন। এই সাধারণ নিরাভরণ ঘটনাটি কবি একটি বেদনা বৃত্তে প্রকাশ করেছেন। জীবনের একটি মধুময় স্মৃতির উৎপ্রেক্ষা নিয়ে কবিতাটি মূল্যবান। এই উৎপ্রেক্ষাকে কবি প্রকৃতির দায়ভাগে প্রস্ফুটিত করেছেন যেখানে অন্ধকার নিশীথিনীর কথা আছে, অরণ্যের ঝিল্লি স্বরের কথা আছে এবং আকাশে জাগরণের ধ্রুবতারার কথা আছে। 'আশার সীমা' কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ নয়।

'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে আটষট্টিটি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। এই কবিতাগুলো কতকগুলো সারগর্ভ ভাষণের সমষ্টি। তত্ত্বকথা, আদর্শ-কথা এবং বিশ্বাসের কথা সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে কবি আশ্চর্য সংহতির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। একটি বৈপরীত্যের সাহায্যে প্রতিটি কবিতার ভাবপ্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'দেবতার বিদায়' কবিতায় কবি বলছেন ভক্ত মন্দিরের মধ্যে একাকী উপাসনা করে, ভাবে এভাবেই সে দেবতাকে পাবে, কিন্তু দেবতা আসেন জীর্ণ মলিন ভিখারীর বেশে এবং আশ্রয় চান। ভক্ত ভিখারীবেশী দেবতাকে চিনতে না পেরে তাকে তাড়িয়ে দেয়। দেবতা তখন বলেন যে, তিনি গৃহহীনের গৃহ দিলেই ভক্তের কাছে ধরা দেন। 'বৈরাগ্য' কবিতায় কবি বলেছেন, গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে দেবতাকে পাওয়া যায় না, দেবতা থাকেন

সংসারের কোলাহলের মধ্যে এবং প্রেম-প্রীতি ও বরাভয়ের মধ্যে। 'পুণ্যের হিসাব' কবিতায় সাধু স্বর্গে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে যৌবন-কালে তিনি যে সংসারে প্রেমময় জীবন-যাপন করেছিলেন সেটাই তার পুণ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু পরিণত জীবনের সাধনা পুণ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। 'সামান্য লোক' কবিতায় কবি বলেছেন যে, যে চাষীকে আমরা সামান্য লোক বলে অভিহিত করি সে হয়ত একদিন কবির কল্পনায় তাৎপর্যবহ হয়ে প্রকাশ পাবে। কবিতাটিতে সামান্য মানুষকে কবি মূল্য দিয়েছেন। 'প্রভাত' কবিতাটি সকাল বেলা শান্ত-স্নিগ্ধ পরি-বেশের প্রশংসায় মুখর। 'দুর্লভ জন্ম' কবিতায় কবি পৃথিবীর কোন কিছুকেই তুচ্ছ বলে গণ্য করতে চাচ্ছেন না। তিনি বলছেন যে, যা তুচ্ছ তাও ঔৎসুক্য জাগাতে পারে। তাই দেবতার কাছে তার প্রার্থনা—তুচ্ছ বলে যা আমরা চাইনি তাই আমাকে দাও। 'খেয়া' কবিতাটি খেয়া পারাপারের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে লেখা। 'সভ্যতার প্রতি' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর। কবি প্রকৃতির ঔদার্য কামনা করছেন, নগর সভ্যতাকে নয়। তিনি বলছেন যে তিনি অরণ্য ফিরে পেতে চান, কেননা অরণ্য নিয়েই পৃথিবীর সজীবতা এবং বিপুল বর্ণাঢ্যতা। নগর সভ্যতা বনা-ঞ্চলকে বিনষ্ট করেছে। 'বন' কবিতাটি একই আবেশে উচ্চকিত। 'তপোবন' কবিতাটিতে কবি প্রাচীন কালের মহা অরণ্যের কথা বলেছেন। 'প্রাচীন ভারত', 'ঋতু সংসার' এবং 'মেঘদূত'—এই তিনটি কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ব্যক্ত করেছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সমৃদ্ধশালী সময়ে মহাকবি কালি-দাসের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই কবি কালিদাসের প্রতি কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'দিদি' কবিতাটি, 'পরিচয়' কবিতাটি এবং 'পুটু' কবিতাটি গ্রামীণ জীবনের তুচ্ছ সংরাগ এবং আনন্দের অভিষেক প্রমাণিত করে। মোটামুটি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের যে সাধারণ জীবন এবং সে জীবনে প্রকৃতির যে বরাভয় তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

'চৈতালি'র 'পদ্মা' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর। যে পদ্মার বুকে নৌকো নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সঙ্গে কবির একটি একাত্মতা গড়ে উঠেছিল। 'পদ্মা' কবিতাটিতে সেই একাত্মতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে 'পদ্মা' নদীর বিস্তৃত কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু

কবিতাটিতে 'পদ্মা' কবিতাটির একটি বিস্তৃত সাড়া পাওয়া যায়। কবি পদ্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর নিজের মধ্যে। প্রতি দিন তাঁর পদ্মার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং নির্জনে নৌকোর মধ্যে পদ্মার সঙ্গে তাঁর একমাত্র সখ্যতা। বাংলা ভাষায় কোনও নদীর প্রতি এমন মমতাময় আত্মীয়তা আর কোন কবি প্রকাশ করেননি। কবি পদ্মার কাছে তার প্রাণ সমর্পণ করেছেন—এ কথাই নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছেন। এক কথায় বলা যায় এ কবিতাটি পদ্মা নিয়ে লিখিত হলেও কবির হৃদয়ানুভূতির কথা। পদ্মাকে গ্রহণ করেই কবির প্রতিটি প্রহরের সমৃদ্ধি, কবির জাগৃতি এবং বিশ্রাম। 'নদীযাত্রা' কবিতাটিতে পদ্মার বিবরণ রয়েছে। 'চৈতালি'র কবিতাগুলো সেই সময়কালের লেখা যখন কবি নৌকো করে পদ্মার বক্ষে সময় কাটাচ্ছেন। আর একটি নদীর উপর কবিতাও এই গ্রন্থে আছে সে নদীটির নাম ইছামতি নদী। মোটামুটি লক্ষ্য করা যায় যে কবি নদীকে তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন করেছিলেন এই কাব্য-গ্রন্থে। কোথাও নদীর বর্ণনা এসেছে, কোথাও নদী উপমা-রূপক হিসেবে এসেছে, আবার কোথাও নদী জীবনের সজীবতা ও সচলতাকে প্রমাণিত করবার জন্য এসেছে। নদী এ কাব্যের নায়ক। নদীর নির্জন তীর, জলস্রোতের উচ্ছলতা, তরঙ্গের বিক্ষোভ—এ সমস্ত কিছু কবিকে আকুল করেছে এবং এগুলোর মধ্য দিয়েই জীবনের পরিচয় তিনি সন্ধান করেছেন। 'গান' নামক কবিতাটির প্রথম স্তবক শুধু জলোচ্ছ্বাস নিয়ে। প্রণয়ের বক্তব্যকে কবি তরঙ্গের উপমায় এবং উচ্ছল নীড়ের উপমায় প্রকাশ করেছেন :

তুমি পড়িতেছ হেসে　　তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।
যৌবন সমুদ্র মাঝে　　কোন পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার!
উচ্ছল পাগল নীরে　　তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে　　কী খেলা তোমার!
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে　　কত নৃত্যে কত সুরে
এসো কাছে যাও দূরে　　শত লক্ষ বার।
তুমি পড়িতেছ হেসে　　তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

'নদীযাত্রা' কবিতাটিতে নির্জন নদীর উপর দিয়ে কবি যখন নৌকো করে ভেসে চলেছেন তার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। বর্ষার ভরা নদীতে তার নৌকো শান্ত বায়ু ভরে ভেসে চলেছে এবং চতুর্দিকের দৃশ্য কবির কাছে সুন্দর মনে হয়েছে। 'বিনয়' কবিতাটিতেও বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর কথা আছে। 'প্রথম চুম্বন' কবিতাটিতে কবি নিস্তরঙ্গ তটিনীর কথা বলেছেন। সর্বশেষ কবিতাটির নাম 'বিদায়'। সে কবিতাটিও নদীকে লক্ষ্য করে লেখা। তিনি তটিনীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে নগরে প্রত্যাবর্তন করছেন। এ বেদনা তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করছে। তিনি বলছেন যে, নগরে তটিনীর মত কলস্বর নেই। 'চৈতালি'তে আরও কয়েকটি কবিতা আছে কালিদাসের যুগকে নিয়ে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান', এর পূর্বে 'ঋতু সংহার' ও 'মেঘদূত' এর কথা আমরা বলেছি। 'চৈতালি' কাব্যের বিশিষ্টতা নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করা যায় :

১. 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে কবি তুচ্ছ এবং লঘু বিষয় নিয়ে নিজের আনন্দ এবং বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছেন।

২. 'চৈতালি'র সকল উপলক্ষ্যই গ্রামের নদী এবং পরিবেশকে কেন্দ্র করে।

৩. 'চৈতালি'তে সনেটের আঙ্গিকে লেখা অনেকগুলো কবিতায় কিছু তত্ত্বকথা এবং বিশ্বাস বক্তব্যের বৈপরীত্যের মাধ্যমে রূপ লাভ করেছে।

৪. 'চৈতালি'তে প্রাচীন সংস্কৃত যুগ এবং কালিদাসের যুগের প্রতি কবির আসক্তি প্রমাণিত হয়েছে।

৫. 'চৈতালি'র ভাষা এবং উপমা-রূপক অলংকার অত্যন্ত সহজ এবং সুস্পষ্ট। কবি সরল এবং সহজ ভাষায় তার উপলব্ধির চৈতন্যকে প্রকাশ করেছেন।

৬. 'চৈতালি' হচ্ছে ছবি ও গানের সমন্বয়। যে ছবি তিনি দেখেছেন তাকে তিনি সুরের মূর্ছনায় প্রকাশ করেছেন।